তারিখ 16 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

59

নাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ...

কাজী আমিনুল ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় হলো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের নাম। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রসর চিন্তা-চেতনা বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রী প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে যেখানে কোন সীমাবদ্ধতা বা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থাকবে না; থাকবে না কোন সঙ্কীর্ণতা, সেই শিক্ষালয়ের নাম বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত নয়। চিন্তা-চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতার উর্ধে নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে কুক্ষিগত। সত্যপ্রকাশ অলীক কল্পনামাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা জানি একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসই তাকে আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের ওপরে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মুক্ত আলোচনা ও চর্চার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে তার অপ্রাপ্ত জ্ঞান। বিকাশ সাধন করতে পারে তার নিজস্ব প্রতিভার। যার উজ্জ্বলতম উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি বলা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের নবীনতর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠ্য-বইয়ের বাইরে জ্ঞানের গভীরতা সৃষ্টিতে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে না, বা রাখার নীতিও সঙ্কীর্ণ। এখানে যেটুকু যা আছে তা কুসংস্কারাচ্ছাদিত, মধ্যযুগীয়, স্বৈরতান্ত্রিক এবং অতিনিয়ন্ত্রিত।

পৃথিবী যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যাপীঠ পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন স্থবির চিন্তা-চেতনাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭৩ সালে একটি অধ্যাদেশ চালু করা হয়। মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ঐ অধ্যাদেশ অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলে আসছিল।

কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার জন্য একটা আলাদা নিয়ম চালু হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হুমকিস্বরূপ।

জটিলতার এখানেই শেষ নয়। একজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাঁর চাকরির শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানই থেকে যাবেন, এতে যে ঐ বিভাগগুলোতে একটা স্থবিরতা জেঁকে বসবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যাপীঠে এই নিয়মটিই এখনও প্রচলিত। ১০ বছরে উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন ৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। যে দেশে লাখ লাখ বেকার, সেদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় এসব পদ শূন্য থাকা প্রহসন ছাড়া আর কি!

অন্যদিকে শিক্ষকদের রাজনীতির শিকার হচ্ছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন যা মেনে নেয়া কষ্টকর। এখানে শিক্ষকরা মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। একটি স্বাধীনতার সপক্ষ সমর্থিত বাম ও মধ্যপন্থী এবং অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষ সমর্থিত ডান ও ক্ষমতাসীন দল। আর এ দুয়ের মধ্যে ক্ষমতাসীন গ্রুপই বেশি শক্তিশালী।

এই প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করতে চান। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে; কবে শেষ হবে তাও বলা কঠিন। এ ছাড়াও উচ্চপদ থেকে শুরু করে নিম্নপদ পর্যন্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রায় সূক্ষ্ম স্বজন-প্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এক দশক কাল। এখানে একটা ভাষা শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয়নি। আজও এখানে একটি মুক্তিযুদ্ধ বা ভাষা আন্দোলন বা তেমন কোন শিল্পীর একটা ভাস্কর্য গড়া হয়নি, বা সে পরিকল্পনাও নেয়া হয়নি। এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যে এখানে হচ্ছে না তা নয়, তবে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা বাজেট বাইরে প্রকাশ করে না। নিশ্চয়ই এর পিছনেও কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে। অন্যান্য ভার্সিটির মতো এখানেও ছাত্র-রাজনীতি রয়েছে। এখানে যেহেতু শিক্ষকদের সিংহভাগ বর্তমান ক্ষমতাসীন ও স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি, জামায়াত পন্থী, ফলে তারই প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্র-রাজনীতির ওপর পড়ে। তবে যে দল দসর্পে প্রকাশ্যে বা গোপনে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের দখলে নিয়ে গেছে সেই সংগঠনের নাম ইসলামী ছাত্র শিবির। তাদেরকে মদদ দিচ্ছে মৌলবাদী কিছু শিক্ষক আর প্রশ্রয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অবশ্য বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মদদপুষ্ট ছাত্ররা এখানে আর কিছু না পারলেও চাঁদাবাজিতে ওস্তাদ। জানা গেছে, মসজিদের কাছ থেকেও তারা চাঁদা আদায় করতে ছাড়েনি।

অন্যান্য ছাত্র সংগঠন যে এখানে নেই, তা নয়। তবে তারা উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে পারে না। কারণ তাদের উভয়সঙ্কট। এ দিকে ছাত্রশিবির, অন্যদিকে জামায়াত কর্তৃপক্ষ। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কথা বলার সুযোগ বা সাহস তাদের নেই বললেই চলে।

এক কথায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-রাজনীতি এখন পুরোপুরি এককেন্দ্রিক এবং সেটা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মানবতা কিংবা জাতীয়তাবোধের কথা এখানে ঠাঁই পায় না। একই কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও শৃঙ্খলিত প্রায়। যেখানে মৌলবাদী শক্তির এতটা প্রভাব, সেখানে মুক্ত স্বাধীন সংস্কৃতি চর্চার প্রশ্নই ওঠে না। প্রকাশ্যে সত্য প্রকাশ এ ক্যাম্পাসে অলীক কল্পনা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এতক্ষণ যে সামান্য তথ্য দিয়েছি, তার আলোকে বলা যায়, এটা নামমাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয়, যে প্রতিষ্ঠানটি শুধু ক'টি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী প্রদান বা অনুমোদনের এখতিয়ার রাখে। যে দেশে "শিক্ষা অধিকার নয়, সুযোগ", সেদেশেই হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা যায়। একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রীর সাথে কথা বলে তার শাস্তির বিধান করা যায়। কিন্তু শিক্ষা সুযোগ না হয়ে অধিকার হলে হয়ত এটা সম্ভব হতো না।